বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 11, Issue 2, 2020

বিএলআরআই এর ৪৩তম পরিচালনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৬ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ. ম. রেজাউল করিম, এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৪৩তম পরিচালনা বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা বোর্ডের সহ-সভাপতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ, মাননীয় স্পিকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য জনাব মোসলেম উদ্দিন, মাননীয় সাংসদ এবং মোছাঃ শামীমা আক্তার খানম, মাননীয় সাংসদ, পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ আবদুল জব্বার শিকদার,অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদা খাতুন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, বিশেষজ্ঞ সদস্য ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, সাবেক মহাপরিচালক, বিএলআরআই, বিজ্ঞানী প্রতিনিধি ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. মোঃ আবদুল জলিল, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইয়াসমিন রহমান, পরিচালক, প্যারাগন গ্রুপ লিমিটেড।

সভায় বিএলআরআই এর গবেষণা কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় ইনস্টিটিউটের ৪ জন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ হলেন- ড. নাথু রাম সরকার, ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন, ড. মোঃ আবদুল জলিল এবং ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। সভায় বিএলআরআই এর সার্বিক কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করার পাশাপাশি বিএলআরআই এর গবেষণা কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন বিষয়ে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। বিএলআরআই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপন করেন ড. নাথু রাম সরকার, মহাপরিচালক, বিএলআরআই।

বিএলআরআই কর্তৃক করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সনাক্তকরণে নমুনা পরীক্ষা শুরু

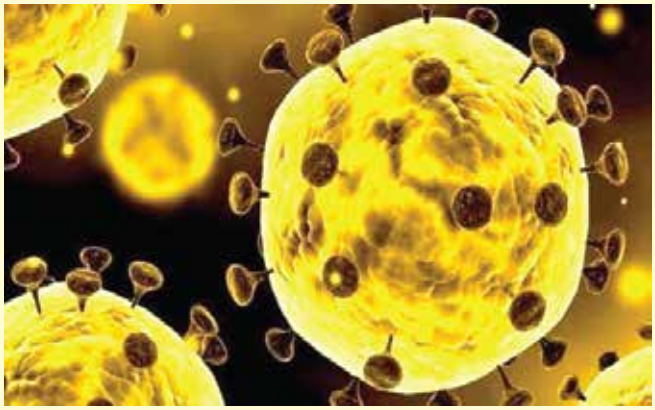

বিগত ২৫/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণে নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এতে আরও বেশি সংখ্যক করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। অত্যাধুনিক ল্যাব সুবিধা সমৃদ্ধ এই গবেষণা ইনস্টিটিউটে ধামরাই ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রাপ্ত ১৯টি নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। বিএলআরআই এর রিয়েল টাইম পিসিআর প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দেশের অন্যতম বৃহৎ বিএসএল-২ (বায়োসেইফটি লেভেল-২) ল্যাবে বায়োলজিক্যাল নিরাপত্তার সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। প্রতিদিন ৩০০টি নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা রয়েছে এ ল্যাবটির। করোনা ভাইরাস সনাক্তকরণে সাভার ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রাপ্ত নমুনা পরীক্ষার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত ২০ এপ্রিল চিঠির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালককে অনুরোধ জানায়। পিসিআর কিট ও অন্যান্য লজিস্টিক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সরবরাহ করবে বলেও এই চিঠিতে জানানো হয়। মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয়ের উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্যে বিএলআরআই ল্যাবকে নির্বাচন করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়। এ সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত নমুনা সংগ্রহ, গবেষণাগারে পাঠানো ও সনাক্তকরণ এবং ডাটা এন্ট্রি ও ডকুমেন্ট তৈরিসহ নমুনা সনাক্তকরণের সার্বিক কাজের জন্য ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে ১৪ সদস্যের একটি টিম এবং এ সংক্রান্ত পুরো কার্যক্রম সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও সহায়তা প্রদানের জন্য ছয় সদস্যের একটি মনিটরিং টিম গঠন করেছে। এ বিষয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম বলেন, 'করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের সামগ্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি করোনা ভাইরাস নির্ণয়ে প্রস্তুত এবং চলমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

বিএলআরআই অফিসার্স ক্ল্যাব এর উদ্যোগে দুঃস্থ ও অসহায়দের নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান

অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রভাবে বেকার হয়ে যাওয়া গরীব ও অসহায় মানুষের মাঝে নগদ অর্থ বিতরণ করে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)। গত ২০/৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বুধবার স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দুরত্ব মেনে বিএলআরআই এর প্রধান ফটকে নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, অফিসার্স ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। কোভিড-১৯ সংক্রমণ এড়াতে নগদ অর্থ তালিকা মোতাবেক বিকাশ নম্বর ও প্রতিনিধি মারফত বিপন্ন মানুষের বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়। দেশের এ দুর্যোগে সরবরাহকৃত নগদ অর্থ বিএলআরআই এর আশেপাশের বিপন্ন, অসহায়, গরীব ও কর্মহীন মানুষের উপকারে আসবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

বিএলআরআই এর আওতায় চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৩-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২০ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কোভিড-১৯ বাস্তবতায় জুন, ২০২০ মাসে বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা সভা বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকার প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের সকল প্রকল্প পরিচালকগণ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদ।

বিএলআরআই মহাপরিচালকের বাঘাবাড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

গত ১৩.০৬.২০২০ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই, আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ীতে খামারীদের গাভি পালনের উপরে ০৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আজহারুল আমিন, বিএলআরআই, প্রফেসর আজাদ রহমান, উপজেলা চেয়ারম্যান শাহজাদপুর, জনাব শাহ মোঃ শামসুজ্জোহা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাহজাদপুর। অতিথিবৃন্দ উক্ত প্রশিক্ষণে খামারীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়াও মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্থাপনাসমূহ, প্রাণিস্বাস্থ্য ও প্রাণী পুষ্টি গবেষণাগার পর্যবেক্ষণ করেন এবং কাজের অগ্রগতি নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করেন।

ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনকারী খামারীদের মাঝে বিভিন্ন ধরণের উপকরণ বিতরণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, যশোর থেকে করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খামারীদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণসহ গবাদি প্রাণী, হাঁস- মুরগি পালন এবং উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্পর্কিত পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প হতে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল পালনকারী খামারীদের মাঝে করোনাকালীন সময়ে সহায়তার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। যার মধ্যে ছিল ছাগলকে কৃমির হাত থেকে রক্ষার জন্য কৃমিনাশক বিতরণ, ছাগলের মারাত্মক রোগ পিপিআর এর ভ্যাকসিন প্রদান, উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং বিতরণ, সার বিতরণ এবং খামারের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি বিতরণ।

"খামার গুরু"- এক মোবাইল অ্যাপসেই খামার বানিজ্যের A to Z

টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যমান খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করে মাংস উৎপাদন দ্বিগুণ করা এসডিজি'র একটি অন্যতম লক্ষ্য (লক্ষ্য-২.৩)। বাংলাদেশে মাংস উৎপাদনে যারা সম্পৃক্ত তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরনের খামারীর সংখ্যা প্রায় ৭০%। বাজারে মাংসের অধিক চাহিদা ও মূল্যমান থাকার কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারভিত্তিক মাংস ও দুধ উৎপাদন (যেমন: গরু ও মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল পালন, দেশি মুরগি পালন, গাভি পালন ইত্যাদি) বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের খামারীরা, এমনকি বেকার যুব সম্প্রদায় ও বিদেশ ফেরত লোকেরা এ ব্যবসায় হরহামেশা লগ্নি করছে। কিন্তু সঠিক নির্দেশনার অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা লাভবান হতে পারছে না। এছাড়া দেশীয় সম্পদের পরিবর্তে (দেশি গরু, ছাগল, মুরগি) আমদানিকৃত উপকরণ (বিদেশি প্রাণীর জাত, বিভিন্ন খাদ্য) দিয়ে একদিকে তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তেমনি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের নিজস্ব জীব সম্পদ (দেশীয় প্রাণী ও খাদ্য ভান্ডার)।

উদ্যোগ:

ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের খামারীরা যেন সঠিক নির্দেশনা অনুসরণ করে সহজেই তাদের খামার পরিচালনা করে লাভবান হতে পারে তার জন্য বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট একটি বিজ্ঞানভিত্তিক এন্ড্রয়েড এ্যাপ (গরু ও মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল পালন, দেশি মুরগি পালন, গাভি পালন ইত্যাদির সঠিক নির্দেশনা সম্বলিত) উদ্ভাবনের সিদ্ধান্ত নেয়। খামারীদের সকল সমস্যার সমাধান কল্পে তৈরি হয় "খামারগুরু"।

বিবরণ:

আদর্শ ও লাভজনক খামার স্থাপন ও পরিচালনার সকল নির্দেশনা সম্বলিত একটি অসাধারণ অ্যাপসের নাম "খামারগুরু"। গরু ও মহিষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, ছাগল বা দেশি মুরগি পালন অথবা ডেইরি ফার্মের জন্য এটি একটি ম্যাজিক বাক্স। খুব সহজে প্রাণীর ওজন নির্ণয়, ওজন অনুযায়ী প্রতিদিনের জন্য পরিমিত পরিমাণ খাবার নির্ণয়, নিজের মতো করে উপযুক্ত রেশন তৈরি, সকল প্রকার খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ, এমনকি সঠিক সময়ে টিকা প্রদান সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সকল বিষয়ের ব্যবহারিক সমাধান চিত্র সহকারে এই অ্যাপসে খুব সহজ ও সাবলীলভাবে সংযোজন করা হয়েছে। যেকোন খামারের সকল সমস্যার সমাধানই আছে "খামারগুরুতে"।

পরামর্শ:

সোজা কথায়, খামার করতে শুরু, লাগবেই "খামারগুরু"। এক কথায় - সমস্যা শতটি, সমাধান একটি "খামারগুরু"। অ্যাপসটি গুগল প্লে-স্টোর ও বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। তাই, আজই ডাউনলোড করুন "খামারগুরু"।

(উদ্ভাবক: নাজমুল হুদা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই)

পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও জটিল রোগ প্রতিরোধের অনন্য উৎস হোক ডিম

ডিমের খাদ্যমান ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ডিম উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ভোক্তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় 'ইন্টারন্যাশনাল এগ কমিশন'-এর সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি বছর অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার 'বিশ্ব ডিম দিবস' পালিত হয়। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও পোল্ট্রি গবেষণার অন্যতম তীর্থস্থান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোল্ট্রি সেক্টরের সাথে জড়িত বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই দিবসটি পালন করে আসছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ দিবসটি পালনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কারণ প্রতি বছর আমাদের দেশে অসংখ্য শিশু ও গর্ভবতী মা পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। দেশের অভুক্ত ও পুষ্টিহীনতার শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে পুষ্টিমানসম্পন্ন নিরাপদ আমিষের অন্যতম উৎস ডিম সহজলভ্য করার জন্য দিবসটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ অপুষ্টির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে, যার প্রায় ৩৫ শতাংশই শিশু। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষিবিষয়ক সংস্থা (এফএও), শিশু তহবিল ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও), আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (আইএফএডি) ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির উদ্যোগে 'বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি বাস্তবতা ২০১৯' অনুযায়ী, ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ৮২ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। এর মধ্যে ৫১ কোটি ৩৯ লাখ মানুষ এশিয়ার এবং ২৫ কোটি ৬১ লাখ মানুষ আফ্রিকায় বসবাস করে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাণিসম্পদ সেক্টরের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক। তাঁর নির্দেশনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, বিএলআরআই, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে খাদ্য নিরাপত্তাসহ পুষ্টি নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা ২০১৭-১৮ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে খর্বাকার (stunted) শিশুর সংখ্যা ৩১%, যা ২০১১ সালে ছিলো ৪১%। অনুরূপভাবে, উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের (wasted) শিশুর সংখ্যা ২০১১ সালে ১৬% থাকলেও ২০১৮ সালে তা কমে ৮% শতাংশ হয়েছে। তাই, অপুষ্টিজনিত সমস্যা সমাধানে প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ডিমকে স্থান দেওয়ার কোন বিকল্প নেই। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ভিশন ২০২১-এ দেশের ৮৫ ভাগ লোকের জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবারের নিশ্চয়তার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। মাথাপিছু সাপ্তাহিক ডিমের চাহিদা ২টি হিসেবে বর্তমানে দেশে বার্ষিক ডিমের চাহিদা ১৭৩২.৬৪ কোটি। আশার কথা হচ্ছে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হয়েছে ১৭৩৬.৪৩ কোটি। অর্থাৎ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক নির্ধারিত জন প্রতি বছরে ১০৪টি ডিম গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে। তবে, উন্নত বিশ্বের মতো বছরে গড়ে মাথাপিছু ২৫০টির অধিক ডিম গ্রহণের জন্য ডিমের উৎপাদন অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই এবং সেই লক্ষ্যেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

ডিম এমনি একটি প্রাকৃতিক খাদ্য যা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টিগুণে ভরপুর।

একটি সম্পূর্ণ ডিমে (৫০ গ্রাম) প্রায় ৬ গ্রাম মানসম্মত প্রোটিন, ৫ গ্রাম উন্নত ফ্যাটি এসিড, ৭০ থেকে ৭৭ কিলোক্যালরি শক্তি, ১৭৫ থেকে ২১২ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল, ১০০ থেকে ১৪০ মিলিগ্রাম কোলিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে। প্রাকৃতিক এই অনন্য খাদ্য উপাদান ডিম নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনকি উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে ভুল ধারণা, যা আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে অনেক বড় বাধা। ৫০ গ্রামের একটি ডিমে রয়েছে প্রায় ২১২ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরলের নাম শুনেই অনেকে ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু শরীরের সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন প্রায় ৩০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল প্রয়োজন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, খাদ্যের মাধ্যমে গৃহীত কোলেস্টেরল মানব শরীরের রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় না। তবে, শতকরা ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে বিশেষ করে যাদের বংশগত 'হাইপার কোলেস্টেরিমিয়া' রোগ আছে। আমাদের লিভার বা যকৃত প্রতিদিনই যথেষ্ট পরিমাণ কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে, কাজেই ডিম খেলে যকৃত কিছুটা কম পরিমাণ কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে। আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে, দুই ধরনের কোলেস্টেরল আছে- একটি হলো HDL (High Density Lipoprotein) আর অন্যটি LDL (Low Density Lipoprotein)। HDL কে বলা হয় 'ভালো কোলেস্টেরল' আর LDL কে 'খারাপ কোলেস্টেরল'। বেশি করে ডিম খেলে রক্তে HDL এর পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে 'হার্ড ডিজিজ' তথা হৃদপিণ্ডর অসুখসহ অনেক জটিল রোগের প্রবণতা কমে যায়। LDL এর মধ্যে আবার দু'টি ভাগ রয়েছে। ছোট ও ঘন কণার LDL ও বড় কণার LDL । রক্তে বেশি মাত্রার ছোট ও ঘন কণার LDL এর উপস্থিতি মানেই 'হার্ড ডিজিজ' তথা হৃদপিণ্ডর অসুখের প্রবণতা বেড়ে যাওয়া। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ডিম যদি কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে LDL এর পরিমাণ বাড়িয়েও দেয় তবে সেটি ছোট ও ঘন কণার LDL থেকে দ্রুতই বড় কণার LDL -এ রুপান্তরিত হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ।

ডিম সম্পর্কে অনেকগুলো ভ্রান্ত ধারণার আরও একটি হলো ডিমের খোসার রং। অনেকের ধারণা সাদা বা বাদামী খোসার ডিমে পুষ্টিগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। মুরগির জাতের ভিন্নতার জন্য খোসার রঙের পার্থক্য হয়ে থাকে যার সাথে পুষ্টিগত মানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আবার অনেকের ধারণা, ডিমের কুসুমের রং গাঢ় হলুদ না হলে সেটি ভালো নয় বা এর পুষ্টি ঘাটতি রয়েছে। কুসুমের রঙের গাঢ়ত্ব নির্ভর করে 'জ্যান্থোফিল' নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থের (পিগমেন্ট) পরিমাণের উপর। হাঁস-মুরগির খাদ্যে যদি জ্যান্থোফিল সমৃদ্ধ উপকরণ বেশি থাকে তবে কুসুমের রংও গাঢ় হবে। মনে রাখা দরকার, এটি কোন ভিটামিন বা মিনারেল উৎস নয় যে, এর কারণে ডিমের পুষ্টিমানের কম-বেশি হবে।

সারণিঃ আমিষ জাতীয় বিভিন্ন খাদ্যে পুষ্টির ঘনত্বের পরিমাণ (প্রতি ১০০ গ্রামে)

পুষ্টি উপাদান	ডিম (সিদ্ধ)	মুরগির মাংস (গ্রিল)	গরুর মাংস (রোস্টেড)	মাছ (সিদ্ধ রান্না করা)
মেটাবলিক এনার্জি (কিলোক্যালরি)	১৪৭	১৪৮	২০২	১৯৪
আমিষ (গ্রাম)	১২.৫	৩২	৩৬.২	২১.৮
চর্বি (গ্রাম)	১০.৮	২.২	৬.৩	১১.৯
স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড (গ্রাম)	৩.১	০.৬	২.৬	২
মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড (গ্রাম)	৪.৭	১	২.৮	৪.৭
পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড (গ্রাম)	১.২	০.৪	০.৩	৩.৩
কোলেস্টেরল (মিলিগ্রাম)	৩৮৫	৯৪	৮৮	৫৪
সোডিয়াম (মিলিগ্রাম)	১৪০	৫৫	৬২	৪৯
ভিটামিন এ (মাইক্রোগ্রাম)	১৯০	সামান্য	সামান্য	১৪
ভিটামিন ডি (মাইক্রোগ্রাম)	১.৮	০.৩	০.৮	৮.৭
ফলেট (মাইক্রোগ্রাম)	৩৯	৬	২১	১৭
বায়োটিন (মিলিগ্রাম)	১৬	২	২	৭
ফসফরাস (মাইক্রোগ্রাম)	২০০	৩১০	২৩০	২৭০
সেলেনিয়াম (মাইক্রোগ্রাম)	১১	১৬	১২	২৮
আয়োডিন (মাইক্রোগ্রাম)	৫৩	৭	১৩	৪

'অরগানিক ডিম' বলতেই অনেকে পাগলপ্রায়। এটি পুষ্টিগুণে টইটম্বুর বিষয়টা এমন না। একটি সমান ওজনের অরগানিক ও বাণিজ্যিক খামারের সাধারণ ডিমের পুষ্টিগুণ বিচার করলে বাণিজ্যিক ডিমেই পুষ্টিগুণ বেশি পাওয়া যায়। কারণটা খুবই সহজ, খামারের মুরগিগুলোকে সঠিক মাত্রার সুষম খাদ্য দেওয়া হয়, ফলে উৎপন্ন ডিমেও পুষ্টিগুণ সঠিক মাত্রার হয়ে থাকে। অপর দিকে, অরগানিক ডিম উৎপন্নকারী মুরগি প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত খাবারের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং, খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের কমতি বা অসামঞ্জস্যের কারণে প্রাপ্ত ডিমেও পুষ্টিগুণ সঠিক মাত্রার থাকে না। এছাড়াও, ডিমের প্রোটিনে রয়েছে মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সকল সঠিক মাত্রার এমাইনো এসিড যা অতিরিক্ত ওজন কমাতে সহায়তা করার পাশাপাশি রক্ত সঞ্চালন, দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়ক। ডিমের কোলিন মস্তিস্ক কোষ গঠন ও সিগনালিং সিস্টেমে কাজ করে মানুষের স্মরণশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। ডিমের কুসুমে রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ লিউটিন ও জিয়াজেন্থিন যা চোখে ছানি পড়াসহ রেটিনার কর্মক্ষমতা ক্ষয় সংক্রান্ত অসুখ 'ম্যাকুলার ডিজেনারেশন' প্রতিরোধ করে দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করে। ডিমে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-এ যা রাতকানা রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অনেকেই ডিম কাঁচা খেয়ে থাকেন যা মোটেও ঠিক নয়। ডিমে অনেক ধরনের

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বিশেষ করে সালমোনেলা থাকতে পারে, তাই ডিম কাঁচা অবস্থায় খেলে পেটের অসুখ হতে পারে। ডিম সিদ্ধ, পোঁচ বা ভাঁজি যেকোন ভাবেই খাওয়া যায়। রান্নার প্রক্রিয়ার কারণে পুষ্টিমাণ প্রাপ্তিতে খুব একটা হেরফের হয় না।

নিকট অতীতে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, নামসর্বস্ব কিছু অনলাইন নিউজপোর্টাল, সংবাদ মাধ্যমসহ বিভিন্ন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে 'নকল ডিম/প্লাস্টিকের ডিম/চায়না ডিম' বিষয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিলো। বলা হচ্ছিল যে, চীনে উৎপাদিত নকল ডিম মিয়ানমার বা ভারত হয়ে বাংলাদেশের বাজারে প্রবেশ করছে। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষ অনেকটা ভয়েই ডিম খাওয়া কমিয়ে দিয়েছিলেন। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞানীরা বিগত মার্চ-২০১৭ খ্রিঃ থেকে জুন-২০১৮ খ্রিঃ সময়কালে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেন। এরই অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন, সীমান্তস্থল বন্দর, বিভাগীয় শহর, জেলা-উপজেলার অর্ন্তগত বিভিন্ন ছোট-বড় বাজারসহ ঢাকাস্থ বিভিন্ন পোল্ট্রি মার্কেট থেকে সর্বমোট ৩৬৬০টি ডিমের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগৃহীত নমুনা সমূহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গুণগত মানের উপাদান সমূহ (প্যারামিটার) বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়াও, সংগৃহীত নমুনা সমূহের সাথে বিএলআরআই এর পোল্ট্রি গবেষণা খামারের ডিমের তুলনা করে কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়নি। দেশে নকল/প্লাস্টিকের ডিমের কোন অস্তিত্ব নেই, এটি নিছক একটি গুজব মাত্র। এছাড়াও, 'নকল/প্লাস্টিক ডিম' শিরোনামে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার নিউজ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, প্রায় সবগুলোই ছিলো 'এ্যাবনরমাল এগ' বা 'ব্যতিক্রমী ডিম'। একটি মুরগি তার ডিম উৎপাদনকালীন সময়ে উৎপাদিত মোট ডিমের শতকরা প্রায় ২-৪.৫ ভাগ এধরনের 'এ্যাবনরমাল ডিম' বা এবড়ো-থেবড়ো আকারের ডিম পাড়ে। এসব ডিমকে 'নকল ডিম' ভেবে ভুল করে। অতি সম্প্রতি, এই গবেষণাটির ফলাফল আর্ন্তজাতিক পিয়ার রিভিউ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে (জার্নাল অব এপ্লাইড সাইন্স, ভলিউম-১৯, ইস্যু-৭, পৃষ্ঠা নং: ৭০১-৭০৭)। https://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2019.701.707&org=11#ref লিংকে ভিজিট করে আগ্রহীগণ আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। ফেসবুক ও ইউটিউবে যেসব নকল ডিমের ভিডিও পাওয়া যায় সেগুলো কোনটিই 'সম্পূর্ণ নয়'। অর্থাৎ, কোন ভিডিওতে দেখা যায় কুসুম তৈরি করতে, কোনটিতে খোঁসা তৈরি করতে আবার কোনটিতে সাদা অংশ (এ্যালবুমিন) তৈরি করতে। কিন্তু, কোন ভিডিওতেই কুসুম, সাদা অংশ (এ্যালবুমিন) ও ডিমের খোঁসা একত্র (এ্যাসেম্বেল) করতে দেখা যায় না। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আতঙ্ক ছড়াতেই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এসব ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও, আমাদের দেশের কিছু অসাধু হ্যাচারি ব্যবসায়ী মাঝে মাঝে ক্যান্ডেলিং করা বাতিলকৃত হ্যাচিং ডিম (বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উর্বর ডিম যা কয়েক দিন ইনকিউবেটরে থাকে) বাজার জাত করেন। এসব ডিম ভাঙ্গলে কুসুম ও ডিমের সাদা অংশ সহজে আলাদা করা যায়না। এগুলোও অনেকে নকল ডিম ভেবে ভুল করেন।

তাই, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে 'মধ্যম আয়ের দেশ', ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে 'উন্নত সমৃদ্ধ দেশ' হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের জন্য জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তার পাশপাশি পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস-ডিম এর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সাথে পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত বিভিন্ন পণ্য নিয়ে বিস্তর গবেষণার পরিধি আরও বাড়াতে হবে। প্রায় ৬০ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী দেশীয় বিকাশমান পোল্ট্রি শিল্প ও এর সাথে সংশিষ্ট সকল খামারি, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, বিজ্ঞানী, গবেষক সকলে মিলে এক সাথে কাজ করলে এই সেক্টরের আরও উন্নয়ন ঘটবে বলে আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। এছাড়াও, গবেষণার ফলাফল ও এই সেক্টরের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যার আলোকে বিজ্ঞানী, গবেষক, সম্প্রসারণকর্মী, নীতিনির্ধারকসহ সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের ডিমের পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা আরও বাড়াতে হবে।

(ড. নাথু রাম সরকার, মহাপরিচালক, ড. শাকিলা ফারুক, এসএসও ও মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী, এসও)

দেশীয় গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নলালিত সোনার বাংলা তথা বিশ্বমানচিত্রে উন্নত বাংলাদেশের আবির্ভাবের পর্যায়ে আমরা বর্তমানে মধ্যম আয়ের দেশ। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বিশ্বে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসডিজি এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং প্রতিটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনসহ দুধ ও ডিম উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। মোট দেশজ উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছাড়াও, দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে এই খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চামড়াসহ বিভিন্ন উপজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। স্থির মূল্যের ভিত্তিতে বিগত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৪৭%, যা টাকার অংকে প্রায় ৪৩২১২ কোটি টাকা। প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৪৭%। জাতীয় জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে কমলেও কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি মূল্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১৩.৪৬%।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সুপারিশ অনুযায়ী একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের প্রতিদিন ন্যূনতম ২৫০ মিলি দুধ ও ১২০ গ্রাম মাংস এবং বছরে ১০৪টি করে ডিম খাওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ দেশগুলোতে দুধ, ডিম ও মাংস গ্রহণের পরিমাণ অনেক বেশি। বর্তমান দেশজ উৎপাদন দুধ, মাংস ও ডিমের ন্যূনতম জাতীয় চাহিদার ৬৬.০৩, ১০৪.১৫ এবং ৯৯.৮৯% যোগান দিয়ে থাকে। বিগত ২০০৯-১০ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে ৩২২.৯১, ৪৯৬.৩৫ এবং ১৯৭.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগণের ক্রয় ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তনসহ নানাবিধ কারণে দেশে দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা বৃদ্ধির এই প্রবণতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ জীববৈচিত্রের আধার হিসেবে পরিচিত। আদিকাল থেকে বাংলাদেশে গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রিতে কৌলিক বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিগুলো হচ্ছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, মুরগি, হাঁস, কবুতর ও কোয়েল পাখি। এসকল গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিগুলোর বাহ্যিক গঠন, উৎপাদন দক্ষতা, পরিবেশ অভিযোজন ক্ষমতাসহ নানাবিধ বিষয়ে বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতা পূর্বকালে দেশের অধিকাংশ গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিগুলো ছিল দেশীয় জাতের। এদের উৎপাদন দক্ষতা কম হলেও পরিবেশের সাথে অভিযোজন ক্ষমতা বেশি এবং মানুষের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আদিকাল থেকে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে কৃষি কাজই ছিল জীবিকা নির্বাহের প্রধানতম উপায়। কৃষিকাজ সম্পাদনে গবাদিপ্রাণি ব্যবহার হতো নানাবিধ কারণে। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলে বিদ্যমান গবাদিপ্রাণিগুলো পালনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য দুধ বা মাংস উৎপাদন ছিল না। বরং কৃষিকাজে নানাভাবে শক্তি সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হত। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের গরু ও মহিষগুলো দুধ ও মাংস উৎপাদনের চেয়ে কৃষিকাজের বেশি উপযোগী।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির নানাধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এসকল কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দেশি জাতকে উন্নত বিদেশি জাতের সাথে সংকরায়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে দেশে সংকর জাতের গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া থেকে শুরু করে পোল্ট্রির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দেশীয় প্রাণিসম্পদের কৌলিক বৈচিত্র্যতা হ্রাস করেছে। উদাহরণস্বরূপ, পাবনা-সিরাজগঞ্জ এলাকার পাবনা জাতের দেশি গরু, মুন্সিগঞ্জ জেলার মুন্সিগঞ্জ জাতের দেশি গরু সংকরায়নের ফলে আজ বিলুপ্তির পথে। বর্তমানে দেশে মোট গরুর প্রায় ৫০%, ছাগলের ৩০-৪০%, ভেড়ার ১৫-২০% এবং মহিষের ৫-১০% সংকর জাতের।

অধিক উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবন না করে শুধুমাত্র সংকর জাতের গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দেশের দুধ ও মাংসের যোগানের চিন্তা করলে দীর্ঘ মেয়াদে তা দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ বেশি বেশি সংকরায়নের ফলে দেশীয় গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে কমতে এক পর্যায়ে এসে সংকর জাত সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্য দিকে আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং অধিকাংশ খামারীদের আর্থিক সামর্থ্য সংকর জাতের গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি পালনের অনুকূলে নয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য দেশি জাতের গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি সংরক্ষণের পাশাপাশি উহাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো প্রয়োজন। দেশে কৌলিক বৈচিত্র্যতা সংরক্ষণের জন্য খামারী পর্যায়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বহিঃ পরিবেশে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অধিক উৎপাদনশীল গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির পাশাপাশি কম উৎপাদনশীল দেশি জাতের গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আবেগ ও সংস্কৃতির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ জাত উন্নয়নের গবেষণায় এদের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নিতে হবে। তবে ব্যয় এবং সময়ের বিবেচনায় সংরক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রজাতি/জাত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ হবে।

অধিক উৎপাদনশীল জাত উন্নয়নের পাশাপাশি দেশীয় জাতের গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিসমূহের বৈশিষ্ট্যায়ন, সংরক্ষণ ও উৎপাদন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিমেল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থা দেশীয় গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিএলআরআই এর দেশি গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রির জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নছকে উপস্থাপন করা হলো।

ছক-১ বিএলআরআই কর্তৃক সংরক্ষণ ও উন্নয়নকৃত উল্লেখযোগ্য দেশি জাতের গবাদিপ্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিসমূহ।

প্রজাতি	জাত	গবেষণা কার্যক্রম শুরুর বছর	বর্তমান সংখ্যা	গবেষণা ফলাফল
গরু	রেড চিটাগাং ক্যাটেল	২০০২	২৫৭	দৈনিক দুধ উৎপাদন ২.৫ - ৩.৫ লিটার থেকে ৪.০ - ৫.০ লিটারে উন্নীত হয়েছে
	বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১	১৯৯৪	২০০	দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.০-৪.০ লিটার থেকে ৫.০-৬.০ লিটারে উন্নীত হয়েছে।
	মুন্সিগঞ্জ ক্যাটেল	২০১৪	৩২	দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩.৫ - ৪.০ লিটার থেকে ৪.০-৪.৫ লিটারে উন্নীত হয়েছে।
মহিষ	দেশি নদীর মহিষ	২০০২	১৬৫	দৈনিক দুধ উৎপাদন ২.৫ - ৩.৫ লিটার থেকে ৪.০ - ৫.০ লিটারে উন্নীত হয়েছে
গয়াল	দেশি	১৯৯০	১০	সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
হরিণ	মায়া হরিণ	২০১২	১৭	সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
ছাগল	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	১৯৯৮	৪০০	দৈহিক ওজন এবং লিটার সাইজ বৃদ্ধি পেয়েছে।
	যমুনাপারি ছাগল	২০০২	১৪২	দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
ভেড়া	যমুনা আববাহিকা অঞ্চলের ভেড়া	২০০০	১৪৫	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।
	বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়া	২০০০	১৭১	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।
	উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া	২০০০	২৬৬	দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে।
মুরগি	নন-ডেসক্রিপ্ট দেশি	২০১০		বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১১০-১২০টি থেকে ১৭০-১৮০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	গলাছিলা	২০১০		বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১২০-১৩০টি থেকে ১৭০-১৮০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	হিলি	২০১০	৩৪৪	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ৯০-১০০টি থেকে ১৩০-১৪০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	রেড জঙ্গল ফাউল (বন্য মুরগি)	২০০৭	২৭	সংরক্ষণ করা হচ্ছে।
বিএলআরআই উদ্ভাবিত বাণিজ্যিক মুরগি	শুভ্রা	২০১১	৫০	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ২৮৫-২৯০টি।
	স্বর্ণা	২০১৮	৫০	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ২৯০-৩০০টি।
	এমসিটিসি	২০১৯	৬৮০	এমসিটিসি ৮ সপ্তাহ বয়সে ৯৫০ থেকে ১০০০ গ্রাম হয় এবং এফসিআর হচ্ছে ২.৩-২.৪।
হাঁস	দেশি কালো (নাগেশ্বরী)	২০০১	২৭৫	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১৩০-১৪০টি থেকে ২৩০-২৪০টি তে উন্নীত হয়েছে।
	দেশি সাদা (রুপালী)	২০০১	২৫০	বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১২০-১৩০টি থেকে ২২০-২৩০টি তে উন্নীত হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল আবহাওয়ায় উন্নত বিদেশি জাত এবং তাদের সংকরজাতগুলো আমাদের দেশে সহনশীল নাও হতে পারে। কিন্তু দেশি জাতগুলো বিরূপ পরিবেশেও আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায়, জাতীয় অর্থনীতি ও দেশের পুষ্টি চাহিদা পূরণে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার বিবেচনায় দেশি জাতসমূহ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য চলমান গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো জোরদার করার পাশাপাশি দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। খামারী পর্যায়ে দেশি জাতগুলোকে সংরক্ষণের জন্য প্রণোদনা প্রদানসহ প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার বিকল্প নেই।

(ড. গৌতম কুমার দেব, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএলআরআই)

উপদেষ্টা
ড. নাথু রাম সরকার
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী
মোঃ আল-মামুন

বিএলআরআই কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত, ই-মেইল : infoblri@gmail.com ওয়েব : www.blri.gov.bd, ফোন : ৮৮০-২-৭৭৯১৬৭০-২, ফ্যাক্স : ৮৮০২-২-৭৭৯১৬৭৫